অমরত্ব

হুমায়ূন আহমেদ

আমার বাবার ফুফুর নাম সাফিয়া বিবি। তিনি অমরত্বের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী, পুত্র-কন্যারা মরে গেল, নাতি মরে গেল, তিনি আর মরেন না। চোখে দেখেন না, নড়তে-চড়তে পারেন না। দিন-রাত বিছানায় শুয়ে থাকার কারণে পিঠে বেড সোর [শয্যাকন্টক] হয়ে গেল। পচা মাংসের গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। রাতে তাঁর ঘরের চারপাশে শিয়াল ঘুরঘুর করে। পচা মাংসের গন্ধে একদিন তাঁর ঘরের টিনের চালে দুটি শকুন এসে বসল। টিন বাজিয়ে, ঢিল ছুড়ে শকুন তাড়ানো হলো। সেই তাড়ানোও সাময়িক, এরা প্রায়ই আসে। কখনো একা, কখনো দলেবলে।

গ্রামের প্রচলিত বিশ্বাস, তওবা পড়ানো হলে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। তওবা পড়ানোর জন্যে মুন্সি আনা হলো। সাফিয়া বিবি বললেন, 'না গো! আমি তওবার মধ্যে নাই। তওবা করতে হইলে অজু করা লাগবে। শইল্যে পানিই ছোঁয়াইতে পারি না, অজু ক্যামনে করব?'

স□ফিয়া বিবির মনে হয়তো ভয় ঢুকে গিয়েছিল, তওবা মানেই মৃত্যু। তিনি মৃত্যু চান না, তবে রাত গভীর হলেই আজরাইলকে ডাকাডাকি করেন। এই ডাকাডাকি মধ্যরাতে শুরু হয়, শেষ হয় ফজর ওয়াক্তে। কারণ তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সাফিয়া বিবির আজরাইলকে ডাকার নমুনা_

'ও আজরাইল! তুই কি অন্ধ হইছস? তুই আমায় দেখস না। সবের জান কবচ করস, আমারটা করস না কেন? আমি কী দোষ করছি?'

সাফিয়া বিবির বিলাপ চলতেই থাকে। আজরাইল তাঁর বিলাপে সায় দেয় না তবে এক রাতে দিল। গম্ভীর গলায় বলল, 'আমারে ডাকস কেন? কী সমস্যা?'

হতভম্ব সাফিয়া বিবি বললেন, 'আপনি কে?'

তুই যারে ডাকস আমি সে।

সাফিয়া বিবি বললেন, 'আসসালামু আলায়কুম।'

গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম!'

[পাঠকরা অবশ্যই বুঝতে পারছেন, দুষ্ট কোনো লোক আজরাইল সেজে সাফিয়া বিবির সঙ্গে মজা করছে। দুষ্টলোকের পরিচয়, তিনি আমার ছোট চাচা এরশাদুর রহমান আহমেদ। প্র্যাকটিক্যাল জোকের অসামান্য প্রতিভা নিয়ে আসা পৃথিবীর অতি অকর্মণ্যদের একজন। তিনি নিশিরাতে মুখে চোঙা ফিট করে বুড়ির সঙ্গে কথা বলছেন।]

সাফিয়া বিবি! বলো কী জন্যে এত ডাকাডাকি?

এমনি ডাকি। আমি ভালো আছি। সুখে আছি। আপনি চলে যান। কষ্ট করে এসেছেন এই জন্যে আসসালাম।

মরতে চাও না?

কী বলেন? কেন মরব? অনেক কাইজ-কাম বাকি আছে।

সাফিয়া বিবি হলেন জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতার দু'টি লাইন-

'গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে

অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।'

বঙ্গদেশের হতদরিদ্র সাফিয়া বিবি দুই মুহূর্তের জন্য ভিক্ষা মাগছেন। এই ভ□ক্ষা তো অতি ক্ষমতাবান নৃপতিরাও মাগেন। বিশ্বজয়ী চেঙ্গিস খাঁ শেষ বয়সে সমরখন্দে এসেছেন। যদি সমরখন্দের আবহাওয়ায় তাঁর শরীর কিছুটা সারে। তিনি

চিকি□সকদের হুকুম দিয়েছেন অমরত্ব পানীয় (Elixir of Life) তৈরির, যে পানীয় তৈরি করতে পারবে সে বেঁচে থাকবে, অন্যদের জন্যে মৃত্যুদণ্ড।

চীনের মিং সম্রাট খবর পেলেন, জিন সেং নামের এক গাছের মূলে আছে যৌবন ধরে রাখার গোপন রস। তিনি ফরমান জারি করলেন, মিং সম্রাট ছাড়া এই গাছের মূল কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। শুধুমাত্র রাজকীয় বাগানে এই গাছের চাষ হবে। অবৈধভাবে কাউকে যদি এই গাছ লাগাতে দেখা যায় বা গাছের মূল সেবন করতে দেখা যায়, তার জন্যে চরম শাস্তি। মৃত্যুদণ্ড।

পারস্য সম্রাট দারায়ুস খবর পেলেন, এক গুহার ভেতরে টিপটিপ করে পানির ফোঁটা পড়ে। সেই পানির ফোঁটায় আছে অমরত্ব। সঙ্গে সঙ্গে গুহার চারদিকে কঠিন পাহারা বসল। স্বর্ণভাণ্ডে সংগৃহীত হতে থ□কল অমৃত। লাভ হলো না।

Elixir of life-এর সন্ধানে এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এটার সঙ্গে ওটা মেশান। আগুনে গরম করেন। ঝাঁকাঝাঁকি করেন। অমরত্ব ওষুধ তৈরি হয় না। সবই পণ্ডশ্রম তবে এই পণ্ডশ্রম জন্ম দিল 'আলকেমি'র রসায়নশাস্ত্রের।

অমরত্বের চেষ্টায় মানুষ কখনো থেমে থাকেনি। যে-কোনো মূল্যেই হোক মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তা সম্ভব হলো না। মানুষ ভরসা করল মৃত্যুর পরের অমরত্বের জন্যে। পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থও (মহাযান, হীনযান ছাড়া) মৃত্যুর পর অমরত্বের কথা বলছে। স্বর্গ-নরকের কথা বলছে। এই পৃথিবীতে যে অমরত্বের সম্ভাবনা নেই, পরক□লে তার অনুসন্ধান। বাদ সাধল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বলে, মানুষের ধ্বংস হয়ে যাওয়া শরীরের ইলেকট্রন, প্রোটনের অমরত্ব আছে। কিন্তু ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রন মানুষের স্মৃতি বহন করবে না।

এই যখন অবস্থা তখন Frank J Tipler একটি বই লিখলেন। বইয়ের নাম Physics of Immortality. এই বইয়ে লেখক দেখালেন পদার্থবিদ্যার সূত্র ব্যবহার করে মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। বইটি সম্পর্কে New York Times বলছে, A thrilling ride to the for edges of modern physics, সায়েন্স পত্রিকা বলছে Tipler একটি মাস্ট□রপিস লিখেছেন। আমরা যা বিশ্বাস করতে চাই, পদার্থবিদ্যা দিয়ে তা-ই বলছেন।

লেখকের পরিচয় তিনি Tulane বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অব ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স।

সমকালীন পদার্থবিদরা স্বীকার করেছেন যে Tipler-এর বইতে পদার্থবিদ্যার কোনো সূত্রের ভুল ব্যবহার নেই। তবে...□ আমি তবের ব্যাখ্যায় গেলাম না। বইটিতে ওমেগা পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে, যেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি। আমি নিজে 'ওমেগা পয়েন্ট' নাম দিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লিখছি। ওমেগা পয়েন্টে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা বলতে পারিনি।

কল্পনা করা যাক আমগাছের মগডালে একটি পাকা আম। বানর আমটি পাড়তে পারছে না কারণ ডাল অত্যন্ত সরু। ডাল ভেঙে পড়ে সে আহত হবে। বানরের হাতে তখন যদি একটি লাঠি দেওয়া হয়, সে লাঠি দিয়ে আম পাড়ার চেষ্টা করবে। তিনবার চেষ্টা চালিয়ে চতুর্থবার সে ডাল ফেলে চলে যাবে। মানুষ সেটা করবে না। আম না পাড়া পর্যন্ত সে লাঠি দিয়ে চেষ্টা করেই যাবে। লাঠির সঙ্গে আরেক লাঠি যুক্ত করবে। মানুষ রণে ভঙ্গ দেবে না।

অমরত্বের সন্ধানে মানুষ কখনোই রণে ভঙ্গ দেয়নি। তাদের প্রধান চেষ্টা ছিল মৃত্যুর রহস্য ভেদ করা। শুরুতে ভাবা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে শারীরিক মৃত্যুঘড়ি বেজে ওঠে; তখন মৃত্যু প্রক্রিয়া শুরু হয়। জরা আমাদের গ্রাস করতে থাকে।

এখন বলা হচ্ছে, মৃত্যুঘণ্টা বা মৃত্যুঘড়ি বলে কিছু নেই। মানবদেহ অতি আদর্শ এক যন্ত্র। যন্ত্রের দিকে খেয়াল রাখলেই জরা আমাদের গ্রাস করবে না। বায়োলজিস্টরা এখন বলছেন, জরার মূল কারণ টেলোমারস (Telomeres) কণিকাগুচ্ছ। এরা DNA-র অংশ, থাকে ক্রমোজমের শেষ প্রান্তে। যখনই কোনো জৈব কোষ ভাঙে, টেলোমার কণিকাগুচ্ছ দৈর্ঘ্যে ছোট হতে থাকে। যখন জৈব কোষের আর কোনো টেলোমার থাকে না তখনই শুরু হয় জরা। আমরা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকি।

বায়োলজিস্টরা পরীক্ষা শুরু করলেন জরাগ্রস্ত ইঁদুর নিয়ে। তাদের দেওয়া হলো টেলমোরজ (Telomerase) এনজাইম। দেখা গেল, তাদের জরা প্রক্রিয়াই শুধু যে বন্ধ হলো তা না, তারা ফিরতে লাগল যৌবনের দিকে।

এই পরীক্ষা মানুষের ওপর করার সময় এসে গেছে। যে-কোনো দিন পত্রিকা খুলে জরা বন্ধ করার খবর পড়া যাবে। গৌতম বুদ্ধ এ সময় থাকলে আনন্দ পেতেন। তিনি জরা এবং মৃত্যু নিয়ে অস্থির ছিলেন। নির্বাণে মানুষ জরা এবং মৃত্যু মুক্ত হবে এটা তাঁর শিক্ষা।

তারপর একি! সত্যি কি মৃত্যুকে ঠেকানো যাচ্ছে? আমার হাতে টাইম পত্রিকার একটি সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১১) প্রচ□ছদ কাহিনী ২০৪৫, The year man Becomes Immortal. প্রচ্ছদ কাহিনী পড়ে জানলাম, ২০৪৫ সালে মানুষ অমর হয়ে যাচ্ছে। মানুষের হাতে আসছে নতুন নতুন টেকনোলজি। টেকনোলজির বৃদ্ধি ঘটছে এক্সপোনেনশিয়েলি। ২০৪৫-এর কাছাকাছি মানুষ Singularity-তে পৌঁছাবে। সিঙ্গুলারিটি শব্দটি এস□ছে Astro Physics থেকে। এর অর্থ এমন এক বিন্দু, যেখানে পদার্থবিদ্যার সাধারণ সূত্র কাজ করবে না। এর মানেই অমরত্ব। ইচ্ছামৃত্যু ছাড়া মৃত্যু নেই। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ২০৪৫ সাল পর্যন্ত আমি এমনিতেই টিকছি না। অমরত্ব পাওয়া এই জীবনে আর হলো না। পৃথিবীতে ফিনিক ফোটা জোছনা আসবে। শ্রাবণ মাসে টিনের চালে বৃষ্টির সেতার বাজবে। সেই অপূর্ব অলৌকিক সংগীত শোনার জন্যে আমি থাকব না। কোনো মানে হয়?

[ঢাকা, শুক্রবার, ০৯ বৈশাখ ১৪১৮, ১৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩২, ২২ এপ্রিল ২০১১]